সূচিপত্র

দুঃখ-প্লাবন দিনে ১৩

সুতরাং, কোথায় যাচ্ছ? ২১

হয়তো-বা তার মন ভালো নেই ৩২

জীবনের পাঁচ সুতো ৩৯

আমি তোমাদের বন্ধু নই ৫৯

সত্যের সাথে সংসার ৭২

ঘটনার ঘনঘটায় জীবনের রূপ ৭৮

হায়াতের দিন ফুরোলে ৯০

হৃদয়ের রোগ ৯৮

তাহাদের আয়নাতে আমাদের মুখ ১১৩

চাঁদের জীবন ১২৩

বিত্তের ব্যবচ্ছেদ ১২৮

যে স্বপ্ন জীবনের চেয়ে বড় ১৩৮

বাড়তি দুটো সিজদাহ ১৪৩

শুভাকাঙ্ক্ষী অথবা শুভংকরের ফাঁকি ১৪৯

একই মৃত্যু, ভিন্ন রেখাপাতে ১৫৫

চোখ ঘুম ঘুম রাত্রি নিঝুম নিঝঝুম নিরালায় ১৬১

হয়তো-বা তার মন ভালো নেই

১

বাবার কাছে আত্মীয়-স্বজন আর প্রতিবেশীদের খোঁজখবর নিচ্ছিলাম। একজন আত্মীয়ের কথা জিগ্যেশ করাতে বাবা বললেন, 'ভালোই তো আছে দেখলাম। আগে দেখা হলে কেমন আছি জিগ্যেশ করত। বিগত কয়েকদিনে দুইবার দেখা হলো। কেমন আছি জানতে চাওয়া তো দূর, সালামটা পর্যন্ত দিলো না।'

বাবার আক্ষেপ হলো—যেহেতু বাবা বয়সে বড় এবং অধিকতর অসুস্থ, ওই আত্মীয়ের উচিত ছিল দেখামাত্র আগে বাবাকে সালাম দেওয়া এবং কুশলাদি জিগ্যেশ করা। আমাদের ওই আত্মীয় এই কাজ অবশ্য সর্বদাই করে। তবে, যেহেতু শেষ দুই সাক্ষাতে বাবাকে সে সালাম দেয়নি এবং কুশলাদিও জানতে চায়নি, বাবার ধারণামতে হয় সে বাবাকে অবজ্ঞা করেছে, নয়তো অহংকারী হয়ে গেছে।

বাবার এমন চিন্তা আমার কাছে প্রশ্রয় পেল না। শুধরে দিয়ে বললাম, 'আপনি যেরকম ভাবছেন ব্যাপারটা তো সেরকম না-ও হতে পারে। মানুষের মন-মেজাজ-মর্জি সবসময় কি একইরকম থাকে? এমন কি হতে পারে না যে—কোনোকিছু নিয়ে সে ভীষণ চিন্তিত? হয়তো আর্থিক টানাপোড়েনে

দিন যাচ্ছে তার। হয়তো শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, অথবা—ছেলেমেয়েদের, কিংবা নাতি-নাতনিদের অসুখ-বিসুখের কারণে মনটা খুবই উদাসীন? কত ধরনের সুবিধা-অসুবিধার মধ্যেই তো মানুষকে বাঁচতে হয়। তা সত্ত্বেও মানুষেরা যে আমাদের সাথে হাসিমুখে কথা বলে, কুশলাদি জানতে চায়, খোঁজখবর রাখে—এই জন্য আমাদের উচিত তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। কেউ যদি কখনো সেটা না করতে পারে, তার ব্যাপারে মন্দ না ভেবে, সুধারণা করাই উত্তম।'

২

এমনটা আমাদের সাথে হয়। প্রায় প্রতিদিন কথা হয় এমন কেউ হয়তো দীর্ঘদিন আমাদের খোঁজখবর নিতে অপারগ হতে পারে। সর্বদা মুখে হাসি জিইয়ে থাকে এমন কাউকেও আমরা মাঝে মাঝে বিষণ্ণ চেহারায় আবিষ্কার করতে পারি। কাউকে অনলাইনে ম্যাসেজ করেছি, সে হয়তো ম্যাসেজটা সীন করেছে কিন্তু উত্তর করেনি। তার মানে কি সর্বদা এটাই যে—সেই লোক আমাকে পাত্তা দেয়নি? উহুঁ, ব্যাপারটা সবসময় এত সরল নয়।

জীবনে আমরা সবাই যে সর্বদা সুখের সাগরে হাবুডুবু খাই তা কিন্তু নয়। সেখানে আমাদের সুখ যেমন আছে, আছে দুঃখও। অর্থের টানাটানি, সম্পর্কের টানাপোড়েন, অসুখ-বিসুখের হাতছানি। কোনো কারণ যদি না-ও থাকে, একেবারে বিনা কারণেও আমাদের মন উদাস আর বিষণ্ণ হয়ে থাকতে পারে। জীবনের এমন মুহূর্ত যখন কেউ পার করে, তার কাছে চারপাশের দুনিয়াটাকে তখন একটু বিস্বাদ লাগাই স্বাভাবিক। বাঁচার তাগিদে তাকে হয়তো আপনার সামনে আসতে হয়, কিন্তু হাসবার যে শক্তি, সেটা তার মনে আপাতত অবশিষ্ট নেই। রাস্তায় হয়তো তার

আমি তোমাদের বন্ধু নই

১

আমার আপারা ঢাকায় খুব একটা আসার সুযোগ পায় না। সংসার, বাচ্চা-কাচ্চা সামলিয়ে ভাইয়ের কাছে এসে বেড়িয়ে যাবে—এমন অবসর তাদের জীবনে খুব ঘন ঘন আসে না বললেই চলে। শেষবার যখন বড় আপা আর মেঝো আপা আমার ঢাকার বাসায় এলেন, জোরপূর্বক তাদেরকে অনেকদিন রেখে দিলাম। ভাই-বোন মিলে কত গল্প আড্ডা, একসাথে কত স্মৃতি রোমন্থন করা যায়!

'ফাস্টফুড' নামের যে বস্তুগুলো শহুরে জীবনে আমরা খাই নিয়মিত—অবসর, আড্ডা আর অবকাশ যাপনে, সেসবের সাথে গ্রামের মানুষজন তেমন অভ্যস্ত হতে পারে না। আব্বাকে জীবনেও বার্গার মুখে তোলাতে পারিনি। শর্মা জিনিসটা মুখে নিয়েই আম্মা হাসা শুরু করেন। পিজ্জার কথা তো বাদই দিলাম। যেসব খাবার ছাড়া শহুরে মধ্যবিত্তের অন্তরাত্মা বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়, সেসব খাবারে গ্রামের মানুষজনের এমন অরুচি বেশ উপভোগ করার মতোই ব্যাপার!

যাহোক, সেবার মনে হলো আপাদেরকে বাইরের খাবার-দাবারও কিছু খাওয়ানো যাক। কী খাওয়াব কী খাওয়াব ভাবতে ভাবতেই মেয়ের মা

বললেন, 'ফ্রাইড রাইস, ফ্রাইড চিকেন আর সাথে স্যুপ আনা যায়।'

চমৎকার আইডিয়া! আপাদেরকে না জানিয়েই বেরিয়ে গেলাম পার্শ্ববর্তী রেস্টুরেন্টের উদ্দেশে। রেস্টুরেন্টে পৌঁছে খাবারগুলো অর্ডার করে আমি তাদের মেন্যুটায় আরেকবার চোখ বোলাচ্ছি এই আশায় যে—অর্ডারকৃত খাবার প্রস্তুত হয়ে আসার মাঝে আমি হালকা-পাতলা কিছু খেয়ে নিতে পারি কি না।

ঘরোয়া রেস্টুরেন্ট—পরিবার-পরিজন নিয়ে এসে নিভৃতে বসে খাওয়া-দাওয়া করার মতো পরিবেশ। আমি বসেছি একেবারে শেষের দিকটায়। যেহেতু বাসার পাশে, তাই অনিয়মিত হলেও এখানে আমার আসা-যাওয়া আছে। অন্যান্য দিনের তুলনায় সেদিন রেস্টুরেন্টে প্রচণ্ড আওয়াজ আর শোরগোলের উপস্থিতি। ঘটনা হলো—কলেজ অথবা সদ্য ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া একদল ছেলেমেয়ে দলবেঁধে খেতে এসেছে রেস্টুরেন্টে। আমার টেবিলের দু'টেবিল সামনে তিন থেকে চারটা টেবিলকে লম্বালম্বি করে পেতে তাদেরকে বসতে দেওয়া হয়েছে। তারা খাচ্ছে এবং সাথে প্রচণ্ড হৈ-হুল্লোড় করছে। নতুন নতুন কলেজ আর ইউনিভার্সিটিতে গেলে রক্তে যে জোশ আর শরীরে যে চাঙা ভাবটা থাকে—এসব তারই সমষ্টি। সুতরাং অবাক হচ্ছিলাম না একটুও।

আমি আমার মতো করেই সময় কাটাচ্ছিলাম, হঠাৎ এত শোরগোলের মাঝেও তাদের একটা কথা আমার কানে এসে আটকে গেল। মেয়েদের কেউ একজন জিগ্যেশ করছে, 'আরেহ, সাগর আসলো না কেন আজকে?'

ছেলেদের মধ্য থেকে উৎসাহী একজন বলল, 'আর বইলো না! সাগর তো এখন আগাগোড়া হুজুর হইয়া গেছে। মেয়েদের সাথে কোনো প্রোগ্রামে যায় না।'

ঘটনার ঘনঘটায় জীবনের রূপ

১

একটা রেস্টুরেন্টে খেতে বসেছি আমরা চার বন্ধু। রেস্টুরেন্টের মেন্যু হাতে যিনি এগিয়ে এলেন তাকে আমাদেরই একজন বললেন, 'এখানে তো সেট মেন্যুগুলো সব ১:৩। ১:৪ এর কোনো সেট মেন্যু নেই?'

মেন্যু হাতে আসা লোকটা আমাদের কোনো জবাব দেওয়ার আগে সম্মুখে উপবিষ্ট রেস্টুরেন্ট ম্যানেজার গলা চড়িয়ে বললেন, 'মেন্যুতে কোথাও কি ১:৪ লেখা আছে? লেখা যেহেতু নাই, সুতরাং ১:৪ বলেও কিছু নাই এখানে।'

আমরা চারজনই রীতিমতো হাঁ হয়ে গেলাম! কাস্টমারের একটা সরল প্রশ্নের জবাব একজন ম্যানেজার এভাবে দিতে পারে তা একেবারেই কল্পনাতীত! ব্যাপারটা সেখানে থেমে গেলে তো পারত, কিন্তু ভদ্রলোক তার উপবিষ্ট জায়গা থেকে রীতিমতো ঝগড়া শুরু করে দিলেন। গলার আওয়াজ এত চড়া আর এত তির্যক যে—মনে হলো তিনি আমাদের কাছে টাকা পান অথবা তার সাথে জমিজমা-সংক্রান্ত ঘোরতর বিরোধ আছে আমাদের।

আমাদের চারজনের মধ্যে আমি ছাড়া বাকি তিনজনের সকলেই সরাসরি

ব্যবসা এবং সেবার সাথে জড়িত। একজন হসপিটালের মালিক, একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, যার রয়েছে নিজস্ব কনসালটেন্সি ফার্ম। আর অন্যজন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত দুইটা প্রকাশনার কর্ণধার। তাদের প্রত্যেকেরই আছে গ্রাহক সেবার মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা। এমতাবস্থায় সেই রেস্টুরেন্টে গ্রাহক সেবার এমন নতুন রূপ দেখে হতভম্ব না হয়ে উপায় কী!

সাধারণত যেটা হয়—রেস্টুরেন্ট-বয়রা হয়তো খানিকটা ভুলচুক করে ফেলে কাস্টমারের সাথে এবং ম্যানেজার এসে সেটা সামাল দেন। তিনি অন্যদের হয়ে স্যরি বলেন, নিজে যুক্ত হয়ে বিষয়গুলো মিটমাট করে দেন। কিন্তু এখানে ব্যাপারটা হয়ে গেছে ১৮০ ডিগ্রি বিপরীত! রেস্টুরেন্ট-বয়গুলো ম্যানেজারের পক্ষ হয়ে আমাদেরকে কমপক্ষে ত্রিশবারের বেশি স্যরি বললেও, ম্যানেজার সাহেব তার গরম মেজাজ দেখিয়েই যাচ্ছেন। ঘটনার আকস্মিকতায় আমাদের তো আকাশ থেকে পড়বার মতো অবস্থা!

যাহোক, বের হয়ে আমরা অন্য রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম। শুক্রবারের দিন—কয়েকজন বন্ধু মিলে একটু খোশগল্প, কিছু কাজের কথা, একটু খাওয়া-দাওয়া করব এমন নিয়তে বসা, কিন্তু তিরিক্ষি মেজাজের এক লোক সমস্ত আয়োজনে পানি ঢেলে দিলো। সকলের ফুরফুরে মন চাপা একটা বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেল। কিন্তু, এই বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে তো মুক্তি দরকার। এমন গুমোট পরিবেশে না খাওয়া যায় আর না কথা বলা যায়।

মানসিক এই টানাপোড়েন থেকে আমাদের টেনে তোলার দায়িত্ব নিতে এগিয়ে এলেন আমাদেরই একজন। খানিক আগের সেই বাজে অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে তিনি বললেন—'দেখুন, পুরুষ মানুষের জীবনটা আসলে গুলিস্তান থেকে চিটাগাং রোড আসার সময়টুকুর মতো। এই সময়টুকুর ভেতরে একজন পুরুষ মুখোমুখি হতে পারে অনেক অনেক ঘটনার। প্রথমে আধ ঘণ্টা গুলিস্তানে দাঁড়িয়ে বাসের জন্য তার অপেক্ষা করা লাগতে পারে। বাসে সিট না থাকলে কখনো দাঁড়িয়ে, আবার কখনো

হৃদয়ের রোগ

১

একবার ফেসবুকের ছোট একটা পোস্টে লিখেছিলাম—'গর্ভবতী নারী কখনোই রোগী নয়। দুনিয়াতে কোনো রোগীই তার রোগকে শরীরের ভেতরে আদর-যত্ন করে বড় করে তোলে না। গর্ভবতী নারী একজন যোদ্ধা, একজন মহীয়সী। সে তার ভেতরে বড় করে তোলে আস্ত একটা পৃথিবী।'

লেখাটার পেছনে একটা প্রেক্ষাপট ছিল। আমার বড় মেয়ে আয়িশা তখন পেটে। এত দিন আমার স্ত্রীকে আমি কেবল 'স্ত্রী' হিশেবে চিনেছি, কিন্তু আয়িশার অস্তিত্বের সংবাদ পাওয়ার পরের সময়টুকুতে তাকে আমি আবিষ্কার করেছি ভিন্ন একটা রূপেও—মা হতে যাওয়া চপলা এক রমণী যে অপেক্ষা করে আছে তার স্বপ্নের পৃথিবীতে নতুন এক চারাগাছের অঙ্কুরোদগমের জন্য। প্রচণ্ড ব্যথায় যখন তাকে কুঁকড়ে যেতে দেখতাম, আমার বুকের ধড়ফড়ানি তখন বেড়ে যেত। আমাকে অস্থির হতে দেখে তিনি বলতেন—'আরেহ, এই সময়ে এরকম হওয়াটাই স্বাভাবিক। এত অস্থির হচ্ছেন কেন? দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে, ইন শা আল্লাহ।'

শরীরের ব্যথায় নড়তে-চড়তে পারেন না, কিন্তু জোরাজুরি করেও আমি

তাকে একটা প্যারাসিটামল খাওয়াতে পারিনি। বলতেন, 'আমার বাচ্চাটার যদি কোনো ক্ষতি হয়ে যায়?'

যাকে এখনো চোখে দেখেননি, যার গলার আওয়াজ শোনেননি শুধু অদৃশ্য স্পর্শ অনুভব ছাড়া—তার জন্য যাবতীয় ব্যথা, যাবতীয় রোগকে কীরকম হাসিমুখে মেনে নিচ্ছেন তিনি! সহৃদয় পাঠক, অনাগত সন্তানের জন্য ব্যাকুল হয়ে যিনি নিজের শরীরের যন্ত্রণাকেও হাসিমুখে মেনে নিতে পারেন, তাকে আমি রোগী বলতে যাব কোন দুঃসাহসে? মূলত আমার স্ত্রীকে কল্পনাতে রেখেই আমার ওই ফেসবুক পোস্টের অবতারণা।

কিন্তু মুসিবত হয়েছে অন্য জায়গায়। পোস্টটা দেওয়ার কয়েকদিন পরে পরিচিত একজন ভাই আমাকে ইনবক্সে অন্য একটা পোস্টের লিঙ্ক দিয়ে বললেন, 'আপনাকে নিয়েই লেখা। পড়ে দেখতে পারেন।'

যথারীতি লিঙ্কে ক্লিক করলাম, কিন্তু যা দেখলাম তাতে আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। 'গর্ভবতী নারী রোগী নয়' মর্মে আমার ছোট্ট যে লেখা, সেই লেখাটা একজন বোন শেয়ার দিয়ে আমার সাথে দ্বিমত করেছেন। তার কথা হচ্ছে আমি ভুল বলেছি। গর্ভবতী নারীকে মহান করে দেখাতে গিয়ে পরোক্ষভাবে আমি তাদের শারীরিক পরিবর্তনটাকে 'ছোট' করে দেখাচ্ছি। এতে করে মানুষ গর্ভবতী নারীদের যত্ন নেওয়া কমিয়ে দিতে পারে। কিন্তু এ-ধরনের দ্বিমতে তো আপত্তির কিছু নেই, বরং পরিশীলিত চিন্তার জন্য এ-ধরনের দ্বিমত সবিশেষ উপকারী। কিন্তু ঘটনা অন্য জায়গায়। দ্বিমত পোষণ করা সেই বোনের লেখায় আরেকজন বোন যা কমেন্ট করেছেন তা সুস্থ চিন্তার কোনো মানুষের কল্পনাতে যে আসা সম্ভব—সেটা কল্পনা করাও দুরূহ। ওই পোস্টের নিচে তিনি লিখেছেন,